বংশলতিকার সন্ধানে

(গল্পগ্রন্থ – অসাধারণ)

সন্ধ্যার কিছু আগে নীরেন ট্রেন হইতে নামিল। তাহার জানা ছিল না এমন একটা ছোট্ট স্টেশন তাদের দেশের। কখনো সে বাংলাদেশে আসে নাই ইতিপূর্বে এক কলিকাতা ছাড়া।

নীরেনের দাদামশাই রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে গিয়া সে যেন জল না ফুটাইয়া খায় না, মশারি ছাড়া শোয় না, নদীর জলে না স্নান করিয়া তোলা জলে স্নান করে। নীরেনের স্বাস্থ্যটি বেশ চমৎকার, ডাম্বেল মুগুর ভাঁজিয়া শরীরটাকে সে শক্ত করিয়া তুলিয়াছে, বড়লোকের দৌহিত্র, অভাব অনটন কাহাকে বলে জানে না। মনে নীরেনের বিপুল উৎসাহ। চোখের স্বপ্ন এখনো কাঁচা, সবুজ।

একটা লোক প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে দাঁড়াইয়া প্ল্যাটফর্মে সাজানো দূর্বাঘাসের ওপর গরু ছাড়িয়াদিয়া গরুর দড়ি হাতে দাঁড়াইয়া ছিল। নীরেনের আহ্বানে সে নিকটে আসিল। নীরেন বলিল—রামচন্দ্রপুর কতদূর জানো ?

লোকটা বলিল—কেন জানব না ?মেটিরি রামচন্দ্রপুর তো ?এখেন থে ঝাড়া তিনকোশ পথ—

—তিন কোশ !

—হাঁ বাবু। কনে যাবেন সেখানে ?

—বাঁড়ুজ্যে-বাড়ি।

—তা যান বাবু এই পথ দিয়ে—

নীরেনের কাছে এ সব একেবারেই নতুন। এই আসন্ন সন্ধ্যায় মাঠের মধ্যের পথ দিয়া সে যাইবে তিনক্রোশ দূরের গ্রামটিতে। ওই মাঠের মধ্যে কত মাটির ঘরে ভর্তি পাড়াগাঁয়ের পাশ কাটাইয়া তাহাকে যাইতে হইবে। মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়স যার—দুনিয়া তার পায়ের তলায়, সে অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে স্বর্ণখনির সন্ধানে বাহির হইতে পারে, সে উত্তরমেরু অভিযানে একঘণ্টার নোটিশে যোগ দিতে পারে, মাত্র একটা ছোট সুটকেসের মধ্যে টুথব্রাশ আর তোয়ালে পুরিয়া।

চৈত্র মাস। স্টেশনের পিছনে মাঠের ধারে বড় একটা নিম গাছ। ফুটন্ত নিমফুলের ভুরভুরে সুবাস বাতাসে। নিমগাছ অবশ্য তাদের আলিগড়েও আছে, কিন্তু এমন রহস্যময়ী অজানা সন্ধ্যা মাঠের প্রান্তে তাহার জীবনে কটা নামিয়াছে ?

নীরেন জানে, যদিও সে দিল্লি ও আলিগড়ে মানুষ, একবার কানপুরে আসিয়া ভাবিয়াছিল, প্রায় বাংলাদেশের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে বুঝি। পাঞ্জাবের অসম জলহাওয়ায় তার শরীর গড়িয়া উঠিয়াছে—হয় ভীষণ শীত, নয়তো দুর্দান্ত গরম—একশো বত্রিশ ডিগ্রি উত্তাপের হাওয়া গা-হাত-পা পুড়াইয়া বহিতেছে—সেখানে গ্রীষ্মের দুপুরে বসিয়া বসিয়া বাদশাহী তয়খানা ও সুন্দরী ইরানীদের স্বপ্ন লুর আগুনে ঝলসাইয়া যায়।

নীরেন মাঠের মাঝখানের পথ বাহিয়া হন হন করিয়া হাঁটিয়া চলিল। দূর মাঠের প্রান্তে চাঁদ উঠিতেছে—নিশ্চয় আজ পূর্ণিমা, নতুবা সন্ধ্যার পরে চাঁদ উঠিবে কেন ?দুখানা গ্রাম পথে পড়ে—রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া গ্রাম্য লোকেরা দেখিতেছে। একজন বলিল—কনে যাবা ?

—রামচন্দ্রপুর।

—বাড়ি কনে ?

—কলকাতা।

কলকাতা বলাই সহজ, কারণ আলিগড় বলিলে ইহারা কিছুই বুঝিবে না। কিছুদূর গিয়া আর একটি ক্ষুদ্র পল্লী—নীরেন্দ্র নাম জিজ্ঞাসা করিল। রাস্তার ধারেই একটা পুরানো কোঠাবাড়ি, গোটা দুই নারিকেল গাছ, দুটি ধানের গোলা নারিকেল গাছটির তলায়। জন পাঁচ-ছয় লোক গোলার কাছে উঠানে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে কথাবার্তা বলিতেছে—নীরেনকে দেখিয়া বলিল—বাড়ি কোথায় ?

—কলকাতায়।

—এদিকি কোথায় যাওয়া হবে ?

—রামচন্দ্রপুর।

তাহারা পরস্পর চাওয়াচাওয়ি করিয়া বলিল—এই রাত্তিরি সেখানে যাতি পারবেন না।

নীরেন বলিল—কেন ?

—তিনকোশ পথ এখান থেকে, তা ছাড়া গরমকাল, মাঠের পথ, সাপ-খোপের ভয়। কার বাড়ি যাবা রামচন্দ্রপুর ?

—বাঁড়ুজ্যে-বাড়ি।

—কোন বাঁড়ুজ্যে-বাড়ি ?সে গাঁয়ে ব্রাহ্মণ তো নেই ?

—এক বুড়ি আছে না ?

—আছেন বটে এক মা ঠাকরোন। ওই বাঁওড়ের ধারে গোলাবাড়িতে থাকেন। তা তিনি আবার মাঝে মাঝে তাঁর জামাইয়ের বাড়ি যান কিনা ?দেখুন আছেন কিনা !

সেখানে পৌঁছাইতে নীরেনের বড্ড রাত হইয়া গেল। গ্রামটিতে চারিধারে বাঁশবন আমবনের নিবিড় ছায়া, প্রথমেই গোয়ালাদের পাড়া, তারপর বড় মাঠ একটা, গোটা দুই বড় পুকুর শ্যাওলায়ও কচুরিপানায় ভর্তি।

পথের ধারে একটা খড়ের ঘরে তখনো টিমটিম করিয়া আলো জ্বলিতেছিল। নীরেনের প্রশ্নের উত্তরে একটি লোক উত্তর দিল, সেই গ্রামই রামচন্দ্রপুর বটে। বাঁড়ুজ্যে-বাড়ির বুড়ি ?হ্যাঁ, আর একটু আগে বাঁওড়ের ধারে সারি সারি নারিকেল গাছওয়ালা বড় আটচালা খড়ের ঘর।

নীরেন বাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিল। বড় একখানা আটচালা ঘরের পাশে ছোট রান্নাঘর, সেখানে আলো জ্বলিতেছিল।

নীরেন উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিল—বাড়িতে কে আছেন ?

একটি বৃদ্ধা টেমি হাতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—কে ডাকে ?

—আমি।

—কে বাবা তুমি ?

—আমাকে কি চিনতে পারবেন ?আমি আলিগড় থেকে আসচি।

বুড়ি টেমিটা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া নীরেনের মুখ দেখিবার চেষ্টা করিল। তাহার মুখে কৌতূহল ও সন্দিগ্ধতার রেখা। হাতের তালু চোখের উপর আড় করিয়া ধরিয়া আলো হইতে চোখ বাঁচাইবার ভঙ্গি করিয়া আরো দু-এক পা আগাইয়া আসিয়া বলিল—কে বাবা ?

—আমার বাবার নাম রাজকৃষ্ণ মুখুজ্যে—

বুড়ি আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বলিল—রাজকেষ্ট ?রাজকেষ্ট ?

—আমাদের পৈতৃক বাড়ি ছিল গড় মুকুন্দপুর—আমার ঠাকুরদাদার নাম তাঁরিণীচরণ মুখুজ্যে—আমার মায়ের বাপের বাড়ি ছিল সামতাবেড়ে, মায়ের নাম ছিল অমিয়বালা—

—ও ! এখন বুঝলাম। তুমি আমার মেয়ের সইয়ের ছেলে !

—হ্যাঁ দিদিমা।

—এসো এসো ভাই। কত কালের কথা সব। তোমাদের মুখ দেখে মরব এইটুকু বোধ হয় ছিল অদেষ্টে। আর সবাই ছেড়ে গিয়েচে বাবা, শুধু আমিই পড়ে আছি।

—সইমা কোথায় ?

—সে তো আজকাল এখানে থাকে না। সে থাকে তার শ্বশুরবাড়ি, এই পাশের গাঁ।

—আমি তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে এসেচি।

—আজ রাত্তিরে এখানে থাকো। কাল যেয়ো এখন সকালে। এখান থেকে দু-কোশ।

—এই যে বললেন পাশের গাঁ ?

—মধ্যে মাদারহাটির মাঠ আর জলা পড়ে যে ভাই ! দু-কোশের বেশি ছাড়া কম হবে না।

নীরেন হাত-পা ধুইয়া ঠাণ্ডা হইয়া বসিল। এ যেন নতুন একটা জগতে সে আসিয়া পড়িয়াছে। এমন দেশে সে কখনো আসে নাই। যে দেশে তাহার জন্ম, সে দেশে এত বনজঙ্গল কেহ কল্পনা করিতে পারে না গ্রামের মধ্যে। নতুন ধরনের গাছপালা, অসংখ্য পাখির কলকাকলী, বনফুলের মৃদু সৌরভ। বুড়ির রান্না শেষ হইতে রাত দশটা বাজিল। কেবল সোঁদা সোঁদা মাটির গন্ধ বাহির হওয়া লেপাপোঁছা মাটির ঘরের দাওয়ায় কলার পাতা পাতিয়া বুড়ি তাহাকে খাইতে দিল। রাঙা আউশ চালের ভাত, পেঁপের ডালনা, সোনা-মুগের ডাল, উচ্ছেভাজা, আলুভাতে, ঘন আওটানো সরপড়া দুধ, দুটি পাকা কলা, একদলা আখের গুড়ের পাটালি। অদ্ভুত রান্না বুড়িরহাতের। আলিগড়ের পশ্চিমা পাচকের হাতের রান্না খাইয়া সে আজীবন অভ্যস্ত—এমন চমৎকার রান্নার সঙ্গে পরিচয় ছিল না।

উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সুরে বলিল—এমন রান্না কখনো খাইনি দিদিমা। শুনতাম বটে বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের রান্নার কথা—কিন্তু এ যে এমন চমৎকার তা ভাবি নি—

বুড়ি হাসিয়া বলিল—রান্না করতে পারতেন আমার শাশুড়ি। তাঁর কাছেই সব শেখা। ডাকসাইটে রাঁধুনী ছিলেন আটখানা গাঁয়ের মধ্যি—

বুড়ির কথার মধ্যে যশোর জেলার টান নীরেনের বড় ভালো লাগিল।

শুইয়া শুইয়া উঠানের নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর পাতার কম্পন দেখিতে দেখিতে নীরেন ভাবিতেছিল, এই তাহার স্বদেশ, তাহার অতি প্রিয় স্বদেশ। এই তাহার মায়ের জন্মভূমি, পিতার জন্মভূমি, পূর্বপুরুষদের জন্মভূমি—বাংলাদেশ। কেন এতকাল সে মাতৃভূমিকে ভুলিয়া ছিল ?ভাগ্যের দোষ। সে কি জানিত এত সৌন্দর্য বাংলাদেশের রাত্রির অন্ধকারে ?গন্ধভরা অন্ধকারে ?পাখির ডাকের মধুর তান সে হিমালয়ে শুনিয়াছে। আলমোড়ায় ল্যান্সডাউনে শুনিয়াছে। তাহার ধনী মাতামহের সঙ্গে কয়েকবার সেসব স্থানে সে গিয়াছিল। দেবতাত্মা নগাধিরাজ মাথায় থাকুন—মাথায় থাকুক ক্যামেলস-ব্যাক-এর অপূর্ব দৃশ্য, মুসৌরির অতুলনীয় গিরিশোভা—এখানকার পক্ষীকুলের সুমিষ্ট কাকলী যেন বহুপরিচিত বিগত দিনের প্রিয়জনের বার্তা বহন করিয়া আনে, কত দিনের ঘরোয়া কাহিনী এদের সঙ্গে জড়ানো।

বুড়ি বলিল—ঘুম হচ্চে না ভালো গরমে বুঝি ?পাখা নেবা একখানা ?

—না দিদিমা। নতুন জায়গা বলে ঘুম আসচে না, গরমে নয়।

—এবার ঘুমিয়ে পড়ো ভাই—

—হ্যাঁ দিদিমা— ?

—কি ভাই ?

—আমার বাবাকে আপনি দেখেছিলেন ?

—না ভাই, আমার কোথাও যাতায়াত ছিল না। শুনিচি তাঁর কথা, দেখিনি কখনো—তোমাদের গাঁ ছিল তো—

—গড় মুকুন্দপুর।

—নাম শুনিচি, তবে যাইনি সেখানে।

সকালে উঠিয়া বুড়ি বলিল—হ্যাঁ ভাই, তোমরা শহরের লোক, সকালে কি খাও ?

নীরেন হাসিয়া বলিল—যা খাই, তা কি দিতে পারবেন দিদিমা ?চা ?

বুড়ি বলিল—ও আমার পোড়া কপাল ! ও-সব যে কখনো খাইনি ভাই, ও-সবের পাটও নেই। একটু বেলের শরবত করে দি। ডোবার ধারের বেলগাছটায় কাল দুটো পাকা বেল পেইছিলাম ভাই।

চায়ের বদলে বেলের শরবত ! উপায় কি ?খাইতেই হইল তাহাকে। বুড়ি বলিল—তুমি কি মনে করে এসেছিলে ভাই ?

সেই কথাটা বলাই নীরেনের পক্ষে শক্ত। সে যেজন্য আসিয়াছে প্রিয় পৈতৃক পল্লীগ্রামটিতে, বৃদ্ধা কি সে কথা বুঝিতে পারিবে ?সে বলিল—বেড়াতে এলাম দিদিমা।

—এর আগে কখনো আসনি ?

—না দিদিমা।

দুপুরের আগেই তাহার যাওয়ার ইচ্ছা ছিল এখান হইতে, কিন্তু বুড়ি ছাড়িল না। দুপুরের পরে রোদ অত্যন্ত চড়িল। বেলা চারটার আগে বাহির হওয়া সম্ভব হইল না। যাইবার সময় বুড়ি তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিল—এসো এসো, ভাই, তোমার সইমার সঙ্গে দেখাশুনো করে আবার এখানে আসবে কিন্তু। ভুলে যেয়ো না ভাই, আচ্ছা ভাই।

আধ ঘণ্টার মধ্যে নীরেন আসিয়া মাদারহাটির মাঠ ও জলার মধ্যে পড়িল। প্রকাণ্ড বিল, পদ্মফুল ফুটিয়া থৈ থৈ করিতেছে, পদ্মের পাতার ভিড়ে জল দেখা যায় না, একদিকে একটি অন্তরীপ মতন স্থানে অনেকগুলি বড় বড় গাছ—নীরেনের ইচ্ছা হইল ওই গাছগুলির তলায় সে কিছুক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম করে। এই সুন্দর জলাভূমি যেন কাশ্মীরের ডাল বা উলার হ্রদের মতো শোভাময়, কিন্তু এসব স্থানে টুরিস্ট ব্যবসায়ীদের ঢাক পিটানোর শব্দ নাই, সুতরাং এমন সুন্দর একটি সৌন্দর্যময় স্থানে কখনো কেহ আসে না।

সইমাদের গ্রামটিতে জঙ্গল তত নাই—ব্রাহ্মণপাড়ায় অনেকগুলি কোঠাবাড়ি, প্রায়ই সব চাষি গৃহস্থ, বড় বড় গোলা উঠানে, গোয়ালবাড়ি-ভর্তি গরু। একজনের উঠানে দোতলা বাড়ি তৈয়ারি হইতেছে, উঠানের বাতাবীলেবু গাছের তলায় মজুরেরা দুমদাম শব্দে সুরকি ভাঙিতেছে। নীরেন সেখানে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—চক্কত্তিদের বাড়ি যাব কোন্ দিকে ?

একজন বলিল—কোন্ চক্কত্তি ?অনেক চক্কত্তি আছে এ গাঁয়ে।

—ঁভুবনমোহন চক্কত্তি।

—সে ও-পাড়ায়। ওই তেঁতুল গাছের পাশের রাস্তা দিয়ে যান—

আধঘণ্টা পরে সে সইমাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার প্রদত্ত পিঁড়িতে বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছিল। নীরেন দেখিল তাহার সইমার বয়স খুব বেশি নয়, মাথার চুল এখনো একগাছি পাকে নাই, রং বেশ ফর্সা, দোহারা চেহারা, এক সময়ে যে ইনি সুন্দরী ছিলেন, এখনো দেখিলে বোঝা যায়।

সইমা চোখের জল ফেলিলেন। অনেক আশীর্বাদ করিলেন। পাকা বেলের শরবত, মুগের ডাল ভিজানো ও আখের গুড় খাইতে দিলেন। সইমাকে পাইয়া নীরেন যেন হারানো মায়ের সান্নিধ্য বহুদিন পরে অনুভব করিল। সে সইমাকে কখনো দেখে নাই এর আগে। সইমা কিন্তু তাহাকে দেখিয়াছিলেন সে যখন দুই বৎসরের খোকা

তখন। প্রৌঢ়া মহিলার বহু পুরানো দিনের শোকস্মৃতি উথলাইয়া উঠিল আজ তাহাকে পাইয়া। এমন কত লোকের নাম করিতে লাগিলেন যাহাদের কথা মায়ের মুখে আলিগড়ে নীরেন শুনিত বাল্যকালে—কত বাল্যস্মৃতি-জাগানো নামাবলী। দেশের-ঘরের সব লোকের নাম। বাঁচিয়া আছে কেউ কেউ এখনো—তবে বেশির ভাগই মারা গিয়াছে।

সইমা বলিলেন—তোর মুখে সইয়ের মুখ যেন মাখানো রয়েচে—

নীরেন হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল।

—সই বড় সুন্দরী ছিল। গ্রামের কাজকর্মে যখন সেজেগুজে নেমন্তন্ন খেতে কি বিয়েথাওয়ায় জল সইতে যেত তখন লোকে দু দণ্ড চেয়ে দেখতো। এদানিং রোগে শোকে আর কিছু ছিল না চেহারার। এখান থেকে চলে যাওয়ার পরে আর কখনো দেখা হয়নি সইয়ের সঙ্গে। সে কতদিন হবে রে নীরু ?

নীরেন মনে মনে হিসাব করিয়া বলিল—তা প্রায় তেইশ-চব্বিশ বছর হল।

—সই মারা গিয়েচে কতদিন ?

—বেশি দিন না, বললাম যে বছর পাঁচেক হবে।

—তাহলে সই বেঁচে থাকলে এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস হত—

—তা হবে, আমারও হল ছাব্বিশ। আপনার ছেলেও তো আমার বয়সী হবে, না সইমা ?

সইমা আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন—কোথায় ছেলে বাবা ?সে ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েচে অনেক কাল।

রাত্রে নীরেন খাইতে বসিয়াছে, সইমা সামনে বসিয়া খাওয়ার তদারক করিতেছেন।

নীরেন বলিল—আপনার আর দিদিমার রান্না সমান। এমন রান্না অনেকদিন খাইনি।

সইমা বলিলেন—তোর মাও ভালো রাঁধত রে—যখন কপাল পুড়ল, এ দেশ থেকে সেইপশ্চিমে চলে গেল, তখন সে কি কান্না ! বলে—সই, আর কি তোর সঙ্গে দেখা হবে ?এই যাওয়াই আমার শেষ যাওয়া। সে ভাগ্যিমানী, স্বগ্‌গে চলে গেল, আমিই রইলাম পড়ে।

নীরেন হাসিয়া বলিল—আপনি না থাকলে আজ কার মুখ চেয়ে এখানে আসতাম বলুন সইমা ?সইমা দুধের বাটি নীরেনের সামনে রাখিয়া পাখার বাতাস দিয়া দুধ জুড়াইতে জুড়াইতে বলিলেন—তোকে যত্ন করবার দিন যখন আমার ছিল তখন এলি নে। এখন কি আছে সইমার, কি দিয়ে বা তোকে যত্ন করব ?হ্যাঁরে, এতদিন পরে কি মনে করে এলি ঠিক বল তো ?

—বলি সইমা, আপনি বুঝতে পারবেন। জানেন, আমি দুবছর বয়সে বাংলাদেশ ছেড়ে গিয়েছিলাম ?

—সে তো খুব জানি।

—আর কখনো এদেশে আসিনি এর মধ্যে।

—তাও জানি।

—এতকাল পরে মায়ের ও বাবার বাক্সের কতগুলো পুরনো চিঠি পড়লাম সেদিন। পড়ে মনটা বড় ব্যাকুল হল জন্মভূমি দেখবার জন্যে। সে সব চিঠিতে আপনার নাম আছে, আমার এক পিসিমার নাম আছে। আমি বাবাকে কখনো দেখিনি, তাঁর সম্বন্ধে, আমার ঠাকুরদার সম্বন্ধে—আরো অনেক নাম আছে বাবার এক পুরনো খাতার মধ্যে— সকলের সম্বন্ধে আমার জানবার বড় ইচ্ছে হল। আমি জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত মামারবাড়ির সকলকে দেখে আসচি, বাপের বাড়ির বা নিজের বংশের কিছু খবর রাখি নে। সেই সব খুঁজে পেতে বার করব বলেই এলাম।

—ওমা আমার কি হবে ! কোথাকার পাগল ছেলে দ্যাখো—

—না সইমা, আপনি ভেবে দেখুন আমার মনের অবস্থা। আমার ছাব্বিশ বছর বয়স হয়েচে কিন্তু এ পর্যন্ত আমাদের বংশের কোনো খবর রাখি নে। বাপের বাড়ির কোনো লোকের কথা জানি নে। অথচ আমার ভয়ানক ইচ্ছে জানবার। আপনি হয়তো ভাববেন এ আবার কি, আমার কিন্তু সইমা ঘুম হয় না এই সব ভেবে—সত্যি বলচি—আপনি আমায় বলে দিন কি ভাবে আমি তা করতে পারি—আমি তো কাউকে চিনি নে—বাংলাদেশের ছেলে, কিন্তু কোনো খবর রাখি নেদেশের।

—সব বলে দেব, এখন খেয়ে শুয়ে পড়ো দিকি দুষ্টু ছেলে আমার !

নীরেন হাসিল। অনেকদিন পরে যেন হারানো মাকে ফিরিয়া পাইয়াছে, সেই ধরনের হাসি সইমার মুখে। ভাগ্যিস সে আসিয়াছিল। শ্যামল বাংলা মা যেন সইমার মূর্তিতে তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাইতেছেন।

চৈত্র মাসের রাত্রি। হু হু দক্ষিণা হাওয়া খোলা জানালা দিয়া বহিতেছে। কি একটা ফুলের তীব্র সুবাস বাতাসে। নীরেন বাংলাদেশের অনেক কিছু গাছপালা চেনে না—কিন্তু তাহার কি ভালো লাগে এই সব পল্লীগ্রামের আগাছা জঙ্গল ! আজ দু দিন তিন দিন মাত্র ইহাদের সহিত পরিচয়—তবুও যেন মনে হয় কত দিনের নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় তাহার শিরা উপশিরায় রক্তের সহিত আবদ্ধ ইহাদের প্রাণস্পন্দন। এই সব বনস্পতির সহিত সে-ও একদিন তাহার প্রিয় জন্মভূমির এই মাটিতে জন্মিয়াছে।

সে একখানা খাতা আনিয়াছে সঙ্গে।

খাতাখানা তাহার পিতামহ ৺গদাধর মুখোপাধ্যায়ের স্বহস্ত-লিখিত। তাহাদের গ্রামের কত প্রাচীন দিনের তুচ্ছ গ্রাম্য ঘটনা ইহাতে কেন যে তাহার পিতামহ টুকিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনিই বলিতে পারিতেন। ক্ষুদ্র এক অখ্যাত পল্লীগ্রামের প্রাচীন ইতিহাসে কার কি ফল ?অমন কত গ্রাম, কত অগুন্‌তি গ্রাম বাংলাদেশে ! কে জানিতে চাহিতেছে তাহাদের ইতিহাস ?গরজই বা কাহার ?

আজ রাত্রে আলোর সামনে বসিয়া খাতাখানা সে খুলিয়া দেখিল। সইমা তাহার বিছানানির্দেশ করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ঘরে সে একা। মাটির ঘর। ছোট জানালা, কাঠের গরাদ। জানালার বাহিরে একটা কি গাছে থোকা থোকা গাদা গাদা ফুল ঝুলিতেছে—কতক ফাটিয়া তাহাদের রাঙা রাঙা বীচি বাহির হইয়াছে—দিনমানে নীরেন লক্ষ্য করিয়াছিল।

খাতার পাতায় লেখা আছে—

"২২ চৈত্র।১২৭২ সাল..."

এইটুকু পড়িয়াই নীরেন অবাক হইয়া যায়। কত কালের কথা !১২৭২ সালেও পৃথিবী এমনি সুন্দর ছিল, এমনি বসন্ত নামিত এ পাড়াগাঁয়ের বন বুকে, এমনি কোকিল ডাকিত রাত্রি দিনে ?সে তখন ছিল কোথায় ?কোন্ অতীত দিনের কাহিনী এ সব ?

মনে পড়ে আলিগড়ে তাদের দোতলার পড়ার ঘরে বসিয়া এই ডায়েরির পুরাতন তারিখগুলা সে পড়িয়া বিস্মিত হইত—কিন্তু তাহার চেয়েও অনেক বেশি বিস্ময়-রহস্যের অনুভূতি আজ তাহার মনে।

তারপর লেখা আছে—

"আজ রামলোচন রায়ের প্রথম পক্ষের স্ত্রী উহাদের আমবাগানে হারাধন মুস্তফির সহিত ধরা পড়িলেন। ইহা লইয়া আজ জ্যাঠামশায়দের চণ্ডীমণ্ডপে সারাদিন ডামাডোল চলিতেছে। রামলোচনের স্ত্রী বলিয়াছেন তিনি নিদ্দুষি। আমের গুটি ঝড়ে পড়িতেছে, তাহাই কুড়াইতে গিয়াছিলেন, হারাধন মুস্তফির কথা কিছু জানেন না। আজ রামলোচন রায়ের স্ত্রীকে দেখিয়াছি। বয়স হইলেও চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। খুব সুন্দরী। সোনা কুমোরের বউ ইহার কাছে দাঁড়াইতে পারে না—"

নীরেন এই ডায়েরিটুকু পড়িয়া কতবার মনে মনে হাসিয়াছে।

পিতামহ গদাধর মুখুজ্যে বহুকাল সাধনোচিত ধামেই সম্ভবত প্রস্থান করিয়াছেন, নীরেনের মায়ের বিবাহ তখনো হয় নাই। সে পিতামহের কার্যের সমালোচনা করিতেছে না, তবুও মনে হয় এই কুম্ভকার বধূটির এইখানে উল্লেখ থাকার কারণ কি ?বিশেষ করিয়া ঠাকুরদাদা ইহারই নাম করিলেন কেন ?গ্রামের সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলিয়া ?না—

হায় রে সে ১২৭২সাল ! আর রামলোচন রায়ের নিরপরাধা সুন্দরী পত্নী যিনি নির্জন দুপুরে বাগানে আমের গুটি কুড়াইতে গিয়া হারাধন মুস্তফির সঙ্গে নিজের নাম যোগ করিবার সুযোগ দিয়া মিথ্যা কলঙ্ক কুড়াইয়াছিলেন একদিন প্রায় আশি বৎসর পূর্বের এক সুমধুর কোকিলমুখরিত, পুষ্পসুবাসামোদিত, প্রেমোচ্ছল বসন্তদিনে—কোথায় তিনি ?আর কোথায় তাঁহার রূপের প্রতিদ্বন্দ্বী সোনা কুম্ভকারের রূপসী বধূ ?আজ এই সব পল্লীগ্রামের মাটিতে তাঁহাদের নাম নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়াই যাইত যদি না তাহার পরলোকবাসী পিতামহ গদাধর মুখুজ্যে এত ঘটা করিয়া উক্ত বধূদ্বয়ের ইতিহাস তাঁহার ডায়েরিতে নিঃস্বার্থভাবে লিখিয়া রাখিতেন !

হাসি পাইবার কথাই তো।

নীরেন ডায়েরি বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল, কিন্তু আজ রাত্রে তাঁহার বংশের পূর্বপুরুষেরা যেন ভিড় করিয়া আশেপাশে তাঁহাদের অদৃশ্য অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন। তাঁহাদের ইতিহাস ভালো করিয়া জানিবার জন্যই তো সে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া বাংলাদেশে তাহার জন্মভূমি অঞ্চলে আসিয়াছে এতকাল পরে। তাঁহারা ঘুমাইতে দিবেন না।

সকালে সইমা ডাকিয়া ঘুম ভাঙাইলেন—ও নীরু, ওঠ বাবা, বেলা ঝাঁ ঝাঁকরচে—

—নীরেনধড়মড় করিয়া বিছানার উপরে উঠিয়া বসিল।

সইমা বলিলেন—তোর আবার চা খাওয়ার অভ্যেস আছে, না ?

—ছিল তো সইমা।

—এখানে কি করি উপায় তাই ভাবচি—

—ভাবতে হবে না। এখানে না হলেও চলবে।

—তা কি হয় বাবা !দেখি। যার যা অভ্যেস—

—না সইমা, কিছু চেষ্টা করতে হবে না। তা হলে আমি দুঃখিত হব।

সইমা কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু আধঘণ্টা পরে এক পেয়ালা ধূমায়িত চা আনিয়া তাহার সামনে রাখিলেন এবং একটা বাটিতে একবাটি মুড়ি। রায়বাড়ি হইতে চা চাহিয়া আনিয়াছেন, সেখানে বাড়িসুদ্ধ সবাই চা খায়।

নীরেন চা পাইয়া মনে মনে খুশি হইল। মুখে বলিল—কেন বলুন তো এ সব—পরের বাড়ি থেকে আনতে যাওয়া।

সইমা বলিলেন—তোর মা থাকলে করতো না ?

—তা কি জানি !

—করতো রে করতো ! শুনবি তোর মায়ের কথা ?

—কি, বলুন ?

—তোর মা বড্ড শান্ত ছিল।

—মাকে আমি দেখেচি, শান্ত ছিলেন, সবাই বল্‌তো।

—একবার সই আর আমি নাইতে গিয়েচি ঘাটে। সাঁতার দিয়ে দুই সই মিলে নদীর মাঝখানে গিয়েচি। এমন সময় ঘাট থেকে কে চেঁচিয়ে বললে নদীতে কুমির এসেচে। আমরা তো তাড়াতাড়ি ঘাটের দিকে এগুচ্চি, এমন সময় সইকে আমি ভয়ে জড়িয়ে ধরলাম। সই যত বলে ছাড়ো ছাড়ো, দুজনেই ডুবে যাব, আমি ততই ভয়ে সইকে জড়াই।

নীরেন রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল—তারপর ?

—তারপর আর কি ! দুজনেই বেঁচে উঠলাম, একখানা নৌকো আমাদের এই অবস্থায় দেখতে পেয়ে ছুটে এল।

—তখন আপনারা একগ্রামেই থাকতেন ?

—হ্যাঁ রে, নইলে আর সই বলব কি করে ?পাগল ছেলে আর কি !

কথাটা নীরেন সন্ধ্যাবেলা তাহার খাতায় লিখিয়া রাখে।

গ্রাম্য-জীবনের কোনো কথা সে বাদ দিতে চায় না। মরুপর্বত ভেদ করিয়া সুদূর পাঞ্জাব হইতে ছুটিয়া আসা (কোনো কটাক্ষ কেহ করিবেন না) তবে কিসের জন্য ?

সইমার শ্বশুরবাড়ি এটা। কিন্তু একটি দেওরপো ছাড়া এখানকার বাড়িতে কেহ থাকে না। দুটি দেওর বাহিরে চাকুরি করে, সেখানেই পরিবার লইয়া থাকে, যে দেওরপো এখানে আছে ওটি পিতৃমাতৃহীন অনাথ। জ্যাঠাইমার কাছে মানুষ হইতেছে। জ্যাঠাইমা ভালোও বাসেন।

দেওরপোর নাম কানু। কানু নীরেনকে খুব ভালো চোখে দেখে নাই। এই দুর্মূল্যের বাজারে ইনি আবার কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলেন ! কেন রে বাবা ! যে তিন বিশ ধান হইয়াছিল, ইনি এখানে আসিলেন,—তাহাতে ক'দিন যায় ?জ্যাঠাইমাও দেখিতেছি নীরু বলিতে অজ্ঞান !

কানু আসিয়া বলিল—যাত্রা দেখতে যাবেন ?

—কি যাত্রা ?

—এই দিগি-গোনাই যাত্রা।

—সে আবার কি ?

—দেখবেন এখন। দিন দিকি একটা টাকা চাঁদা !

নীরু একটা টাকা বাহির করিয়া কানুর হাতে দিল।

গোনাই যাত্রার আসরে বসিয়া নীরেন যাত্রা তত দেখে নাই, যত সে এই সুন্দর রাত্রিটি ও যাত্রার আসরের পরিবেশের কথা চিন্তা করিয়াছে। যেখানে যাত্রার আসর, সেটা ছোট একটা মাঠ, তার চারিপাশে বনজঙ্গল, একদিকে বনের প্রান্তে একটা কামারের দোকান, সেখানে এখনো হাপরেআগুন জ্বলিতেছে। বাঁশের খুঁটিতে পাল টাঙানো হইয়াছে। পান-বিড়ির দোকান বসিয়াছে, চাষা লোকে যাত্রা দেখিতে আসিয়া পানের দোকানের সামনে ভিড় করিতেছে। একটা মুচকুন্দ চাঁপার গাছতলায় ফুল পড়িয়া বিছাইয়া আছে। বাতাসে মুচকুন্দ চাঁপার সুবাস।

একটি গ্রাম্য মেয়ে ছিল গোনাই বিবি। তারই সুখ-দুঃখের কাহিনী। নীরেনের পক্ষে এমন বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু যারা শ্রোতার দল, তাদের সারারাত্রি জাগিয়া দেখিবার বস্তু। ভ্রাতার বিরহে কাতরা তরুণী গোনাই বিবির সে করুণ গান, 'ও বছির, বছির রে, বৈঠা হাতে নিলি রে' অনেকের চোখে জল আনিয়া দিল।

নীরেন ভাবিতেছিল বহুদূরের লিপুলেক গিরিবর্ত্মে বরফ গলিয়াছে। দলে দলে ঝব্বুর পিঠে বোঝাই দিয়া যাত্রীরা চলিয়াছে মানস সরোবর ও কৈলাসের পথে। গুরলা মান্ধাতার তুষারাবৃত শৃঙ্গ সায়াহ্নদিনের সূর্যকিরণে সোনার রং ধরিয়াছে। তাহার দাদামহাশয়ের বন্ধু করালীচরণ মজুমদার সস্ত্রীক এই মাসের শেষে মানস

সরোবরে রওনা হইবেন, সঙ্গে যাইবেন নীরেনের দিদিমা ও বড় মামীমা, বাড়ির গোমস্তা নাদু চক্কত্তি। আলিগড় হইতে আলমোড়া। আলমোড়া হইতে ধারচুলা। ধারচুলা হইতে লিপুলেক পাস। লিপুলেক হইতে মানস সরোবর। সে নিশ্চয় যাইত ওখানেথাকিলে।

কিন্তু সেজন্য তার দুঃখ নাই !

বাংলাদেশে সে আসিয়াছে মাতৃভূমির সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের সন্ধানে। গাছপালায় পাখির কাকলীর মধ্যে দিয়া সে পরিচয় দিনে দিনে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। ঐ মুচকুন্দ চাঁপার ফুল যেন কতকাল পূর্বের কোন বিস্মৃত অতীত শৈশবদিনে তাহার অজ্ঞাতসারে একদা সৌরভ বিতরণ করিয়াছিল—মায়ের মুখের সঙ্গে সে দিনটির ছন্দ একই তারে গাঁথা হইয়া আছে তার মনের বীণায়।

পরদিন গ্রাম্য নদীর ধারে একটা বড় নিমগাছের তলায় সে দাঁড়াইল।